চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

প্রশ্ন ▶১ লোপা ম্যাডাম সমাজবিজ্ঞান ক্লাশে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিলেন যে, এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি নিবাস ত্যাগ করে ভারত বর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসাম রাজ্যে এসেছিলো। তাদের মূল নিবাস ছিল বর্তমান চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সিন জিয়াং প্রদেশ। বর্তমানে তারা বেশির ভাগই ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. কত সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পায়? ১

খ. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কীরূপ বৈষম্য ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে লোপা ম্যাডাম যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলেছেন তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনধারা আলোচনা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পায়।

খ পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নিরক্ষর রাখা। ১৯৫৫-৬৭ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২,০৮০ মিলিয়ন রূপি বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৫৯৭ মিলিয়ন রূপি। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে লোপা ম্যাডাম গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি-নিবাস ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসাম রাজ্যে এসেছিল। তাদের মূল নিবাস ছিল বর্তমান চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সিন কিয়াং প্রদেশে। বর্তমানে তারা বেশির ভাগই ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব তথ্যের সাথে গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সম্পূর্ণরূপে মিল রয়েছে। গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

গারোদের দৈহিক আকৃতি মাঝারি ধরনের এবং দেহ লোমহীন, দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য কম, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং ফর্সা থেকে শ্যামলা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় গারোরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হয়।

ঘ গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন বৈচিত্র্যময়।

উদ্দীপকে গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। কারণ গারোদের বেশির ভাগই ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে, যা উদ্দীপকেও বর্ণিত হয়েছে। গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিম্নরূপ:

গারো মহিলাদের নিজেদের তৈরি পোশাকের নাম 'দকমান্দা' ও 'দকশাড়ি'। পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'গান্দো'। গারোরা ভাতের সাথে মাছ ও শাকসবজি খেয়ে থাকে। তাদের একটি বিশেষ খাদ্য হচ্ছে কচি বাঁশ গাছের গুঁড়ি। এর জনপ্রিয় নাম 'সিউয়া'। এছাড়াও তারা কলাপাতা মোড়ানো পিঠা, মেরা পিঠা এবং তেলের পিঠা খেতে পছন্দ করে। গারোরা খুব আমোদ-প্রমোদ প্রিয়। তাদের সামাজিক উৎসবগুলো কৃষিকেন্দ্রিক। তাদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'। বাংলাদেশের গারোদের ভাষা হলো 'আচিক খুসিক'। এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। গারো ভাষা তিব্বতীয়-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গারোদের আদি ধর্মের নাম ছিল সাংসারেক। বর্তমানে গারোদের অধিকাংশ ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। গারোদের মধ্যে মৃতদেহ পোড়ানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ রীতা গোমেজের বাড়ি ময়মনসিংহ অঞ্চলে। সেখানকার খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল থেকে পাস করে এখন সে হলিক্রস কলেজে অধ্যয়ন করছে। বড়দিনের অনুষ্ঠানে রীতা তার বান্ধবীকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসে। খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী হলেও সে বান্ধবীকে বলে, আমাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম সংসারেক এবং নিজেদেরকে পরিচয় দিতে আমরা প্রায়ই মান্দি বলে থাকি। বিকেলে বাড়ির ভেতর ও বাইরের আঙিনা দেখিয়ে সে আরও বলে, এই যে সহায়-সম্পত্তি দেখছ তার সবকিছুর মালিক আমার মা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে আমি-ই এর মালিকানা পাবো।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় কী? ১

খ. চাকমা সামজে আদাম বা পাড়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রীতা গোমেজ কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রীতাদের জীবনধারায় বর্তমানে যেসব পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি।

খ চাকমা পারিবারিক সংগঠনের চেয়ে বৃহৎ সংগঠন হলো পাড়া বা আদাম।

বস্তুত কতকগুলো চাকমা পরিবারগুচ্ছ নিয়েই গঠিত হয় আদাম। আদাম আবার ক্ষুদ্রতম চাকমা প্রশাসনিক এককেরও নাম।

আদামের প্রধানকে বলা হয় কারবারি। কারবারি নিয়োগ করেন চাকমা রাজা। তবে চাকমা রাজা মৌজা প্রধান এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই কারবারিকে নিয়োগ করেন।

গ রীতা গোমেজ গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।
বাংলাদেশের যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে গারোরা অন্যতম। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও কিছু সংখ্যক গারো বাস করে।
ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গারোরা বসবাস করে। গারো অঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে গারোরা শিক্ষালাভ করে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের ৯০% ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম সাংসারেক। তারা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। গারো পরিবার মাতৃগোত্রীয়। অর্থাৎ সম্পত্তি ও বংশ নাম মাতৃধারায় মাতা থেকে মেয়েতে বর্তায়। গারোদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি রীতা গোমেজের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, রীতা গোমেজ গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

ঘ বর্তমানে রীতাদের অর্থাৎগারো সমাজের জীবনধারায় বেশকিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
গারো সমাজ নানা কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষিতে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ, বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশ, প্রতিবেশী বাঙালি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক প্রভাব ইত্যাদির ফলে গারো সমাজে পরিবর্তন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
আগের জুমচাষের পরিবর্তে হাল কৃষি প্রবর্তিত হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থারও পরিবর্তন এসেছে। মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলনের ফলে আর্থিক বৈষম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বর্তমানে বাংলাদেশে গারোদের ৯০% খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী। ঐতিহ্যবাহী ধর্মের পরিবর্তে অনেকেই তাই খ্রিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করছে। খ্রিষ্টীয় চার্চ এখন তাদের ধর্মের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান।
গারো সমাজ এখন আর বিচ্ছিন্ন জনপদ নয়। গারো সমাজে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী গারো গ্রামপ্রধানের গুরুত্ব কমে গেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ বরেন্দ্র অঞ্চলে শফিকদের অনেক কৃষিজমি আছে। সেসব জমিতে মজুরের ভিত্তিতে কাজ করা বেশির ভাগ শ্রমিকই এথনিক সম্প্রদায়ের। তাদের গায়ের রং কালো এবং নাকের গড়ন নিগ্রোদের মতো খ্যাঁদা ও চ্যাপ্টা। এরা একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হলেও বিশ শতকের প্রথম ভাগে তাদের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. ঝুমুর নাচ কোন সমাজে প্রচলিত? ১
খ. মণিপুরি নৃত্যের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুমুর নাচ সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত।

খ মণিপুরিদের নৃত্য ও সংগীত বেশ প্রসিদ্ধ।
মণিপুরিরা নৃত্যের সাথে সাথে লোকগীতি পরিবেশন করে থাকে। বিবাহ-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে তারা নৃত্যগীতের আয়োজন করে থাকে। পৃথিবী সৃষ্টির মূলেও এই নৃত্যের বিশেষ অবদান আছে বলে মণিপুরিদের বিশ্বাস। মণিপুরি নৃত্যের মধ্যে 'লাইহারাইবা' সর্বাধিক আলোচিত ও প্রসিদ্ধ।

গ উদ্দীপকে সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা অন্যতম। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং একই রকম দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় তারা মূলত কৃষি শ্রমিক। সাঁওতালদের গায়ের রং গাঢ় কালো এবং এদের নাকের গড়ন নিগ্রোদের মতো খগদা ও চেপ্টা। সাঁওতালরা একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। তবে বিশ শতকের প্রথমভাগে সাঁওতালদের দ্বারা সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা। সাঁওতালদের উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে শফিকদের কৃষি জমিতে মজুরের ভিত্তিতে কাজ করা এথনিক সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বৈচিত্র্যময়।
সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি। বলতে গেলে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ সাঁওতাল পরিবার ভূমিহীন। এদের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি হলেও এরা মূলত কৃষিশ্রমিক এবং কেউ কেউ গোচাষি। এছাড়া কিছু ছোট কৃষক রয়েছে। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। সাঁওতাল মেয়েরা কাঁধের ওপর জড়িয়ে শাড়ি পরে। পুরুষরা লুঙ্গি পরে। এরা ছন বা খড়ের তৈরি ঘরে বাস করে। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে হাট বা মেলার ব্যবস্থা আছে। সাঁওতাল পরিবারে পিতাই পরিবারের প্রধান। এদের নিজস্ব ভাষা আছে। এরা হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী। সাঁওতালরা ভূতপ্রেতের উপাসনা করে থাকে। সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ দেবতা হলো চান্দো। সাঁওতাল সমাজে ঝুমুর নাচ বেশ প্রচলিত। বছরে মোট পাঁচটি পর্ব সাঁওতাল সমাজে দেখা যায়। সাঁওতালদের বিয়েতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এরা চাল থেকে 'হারিয়া' নামক এক ধরনের মদ তৈরি করে। পুরুষ ও মহিলারা সবাই এই মদ খায়। বিশেষ করে উৎসবের সময় এরা মদ খেয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। মেয়েরা উৎসবের সময় হাত-পা ও গলায় পিতলের বা নিরেট কাসার গয়না পরে। পুরুষদের কেউ কেউ গলায় মালা ও হাতে বালা পরে থাকে।
উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনব্যবস্থা আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ ঢাকার মণিপুরি পাড়ার বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমাদের মহল্লার নামে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি আছে; যারা বৃহত্তর সিলেট জেলায় বাস করে। এদের নিজস্ব একটি ভাষার নাম মৈতৈ। শারীরিক গঠন কাঠামোগত বিবেচনায় এদের সাথে চীনা ও বার্মিজদের মিল পাওয়া যায়। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. কারা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেয়? ১
খ. সাঁওতালদের রাজনৈতিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠীর সমাজ -সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

[redacted] গারোরা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেয়।

[redacted] সাঁওতালরা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মানুষ।

সাঁওতাল গ্রাম কয়েকটি বৃত্তে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি বৃত্তের তত্ত্বাবধান করেন একজন 'পঞ্চায়েত' যার অধিকারে কয়েক একর নিষ্কর ভূমি থাকে। প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েত রয়েছে। 'মাঝি' হলো গ্রামপ্রধান। তার একজন সহকারীও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে তারা তাদের দৈনন্দিন নানা বিষয় এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। এরা একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হলেও এই অঞ্চলে বিশ শতকের প্রথম ভাগে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ বেশ আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা।

[redacted] উদ্দীপকে মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর মতো মণিপুরিরাও বহিরাগত। কথিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক মণিপুরি রাজপুত্র কোনো কারণে বর্তমান সিলেট অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। তিনি এবং তার সফর সঙ্গীরাই বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

মণিপুরি পাড়ার বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমাদের মহল্লার নামে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি আছে; যারা বৃহত্তর সিলেট জেলায় থাকে। তাদের নিজস্ব ভাষার নাম মৈতেয়। শারীরিক গঠন কাঠামো গত বিবেচনায় চীনা ও বার্মিজদের সাথে এদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপকের বর্ণনানুসারে এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে পাঠ্যবইয়ের মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুরোপুরি মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।

[redacted] মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যময়।

বাংলাদেশের মণিপুরি সম্প্রদায় ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক মণিপুরি রাজপুত্র কোনো কারণে বর্তমানে সিলেট অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তিনি এবং তার সফরসঙ্গীরাই মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

গোত্র বিভাগ অনুসারে মণিপুরিদের ম ধ্যে দুইটি ভাষা প্রচলিত। যথা-বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ও মৈতৈ ভাষা। মণিপুরিরা হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণবীয় মতবাদে বিশ্বাসী। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতোই মণিপুরিরা দুইটি গোত্রে বিভিক্ত। যথা- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈতৈ মণিপুরি। মণিপুরিদের পাড়াভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের ঘরবাড়িগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ছনের ছাউনি দেয়া, বাঁশের বেড়া ঘেরা কুঁড়েঘর। এছাড়া টিনের ছাউনি দেওয়া দালানঘর রয়েছে। মণিপুরিদের পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ। এ পোশাক তারা নিজেরাই তৈরি করে থাকে।

মণিপুরিদের মধ্যে বহির্বিবাহ প্রচলিত। বিধবা বিবাহ, তালাকপ্রাপ্ত রমণীদের বিবাহ প্রচলিত। পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ব্য বস্থা থাকলেও বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। মণিপুরিদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। এরা স্থানান্তর ও সমতল ভূমিতে কৃষিকাজ করে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই কৃষিকাজ করে।

এরা হিন্দুধর্মের বৈষ্ণবীয় মতবাদে বিশ্বাসী। মণিপুরি পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরিধান করে। বর্তমানে মেয়েদের শাড়ি পরতে দেখা যায়। মণিপুরিরা ভাত, মাছ, শাকসবজি খেয়ে জীবনধারণ করে। মাংস খায় না; তাই তাদেরকে নিরামিষভোজী বলা হয়। মণিপুরিদের নৃত্য ও সংগীত বেশ প্রসিদ্ধ। বিবাহ -অনুষ্ঠান, পূজা -পার্বণে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের নৃত্যের মধ্যে 'লাইহারাউবা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

[redacted] ছক-ক ছক-খ

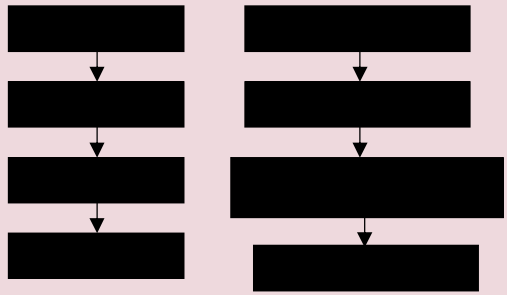

◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. চাকমা সার্কেলের প্রধান কে? ১

খ. চাকমাদের সামাজিক সংগঠনের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ক ও খ নং ছক কোন কোন নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বহন করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠী দুটির আর্থ-সামাজিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

[redacted] চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা রাজা। **A**

[redacted] বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমারা প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত। যথা– ১. চাকমা (Chakma) ২. তঞ্চঙ্গা (Tanchangya) এবং দৈংনক (Doingank)। চাকমা ও তঞ্চঙ্গা উভয় সমাজে প্রায় ৪৬টির মত উপদল রয়েছে। চাকমা সমাজে বিদ্যমান ক্ষুদ্র সংগঠনই হলো পরিবার তারপর গোত্তি বা গোজা। এর চেয়ে বৃহৎ আয়তনের সামাজিক একক হচ্ছে পাড়া বা আদাম। তার চেয়েও অধিক আয়তন হলো গ্রাম বা মৌজা। এভাবে মৌজার পরবর্তীতে বৃহত্তর চাকমা সমাজ বলতে চাকমা সার্কেল তথা চাকমা জাতির সংগঠনকে বোঝায়। **A**

[redacted] উদ্দীপকের ক ও খ নং ছক সাঁওতাল ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। **A**

উদ্দীপকে ছক-ক এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো, আদি অস্ট্রেলীয়, উত্তরাঞ্চলে বসবাস, ঝুমুর নাচ, মারঙবুরু দেবতা। আমরা জানি, বাংলাদেশের রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ , নাটোর ও দিনাজপুর জেলায় অধিকাংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সাঁওতালরা অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, বিশ্বব্র হ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হলো ঠাকুর জিংরা আর জাগিত দেবতা মারঙবুরু। সুতরাং উদ্দীপকে ছক-ক এ

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারা সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে, উদ্দীপকের ছক-খ এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য হলো, মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী, সিলেট জেলায় বসবাস। লাইহারাউবা নৃত্যসহ বিভিন্ন নৃত্যে পারদর্শী, তিনটি জাতিসত্তা। এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সিলেট জেলার মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মণিপুরিদের বিভিন্ন প্রকারের নাচ সর্বমহলে অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রশংসিত। এছাড়াও এরা গঠনগত দিক থেকে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের ছক-ক ও খ যথাক্রমে সাঁওতাল ও মণিপুরিদের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ঘ উদ্দীপকের সাঁওতাল ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। A

সাঁওতালরা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মানুষ। তাদের সমাজ সংগঠন খুবই দৃঢ় এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাঁওতাল সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। এ সমাজে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অধিকার থাকে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে কন্যাদের কোন অধিকার থাকে না। বর্তমানে সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় হলো কৃষিকাজ। এছাড়া কিছু কিছু সাঁওতাল জেলে, কুলি, চা বাগানে মাটি কাটার কাজও করে থাকে। অনেকে ঘরে বসে বিভিন্ন কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো খুব একটা সচ্ছল নয়। অপরদিকে, মণিপুরিদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হলো কৃষি। এরা বেশ কর্মঠ হওয়ায় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কৃষিকাজে লিপ্ত হয়। মণিপুরিদের সমাজকে স্বনির্ভর অর্থনীতিভিত্তিক সমাজও বলা যায়। মণিপুরিদের নির্মিত তাঁতজাত বস্ত্রাদি এক বিরাট অর্থকরি দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। এদের পারিবারিক জীবনযাত্রায় পিতাই পরিবারের সর্বেসর্বা। এ সমাজে একই গোত্রভুক্ত লোকদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এছাড়াও মণিপুরি বৈষম্য ধর্মের অনুসারী এবং সাঁওতালরা মূলত বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা যেকোনো মঙ্গল-অঙ্গলের জন্য সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মণিপুরি ও সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতির ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

প্রশ্ন ▶৬ কাপ্তাইয়ের ঐতিহ্যবাহী চিৎমরম বৌদ্ধবিহারে উদযাপিত হলো সাংগ্রাই উৎসব। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোমাং রাজপুত্র চঃহল প্রু চৌধুরী। এ উৎসবে তরুণরা মাথায় গমবং, গায়ে জামা ও লুঙ্গি পড়ে এসেছিল এবং তরুণীরা আঞ্জি ও থামি পরে এসেছিল। ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা কী? ১

খ. রাখাইনদের পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তাদের ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি।

খ বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় রাখাইনরা বাস করে। রাখাইনরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, দেহের রং ফর্সা এবং চুল সোজা।

গ উদ্দীপকে মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, কাপ্তাইয়ের ঐতিহ্যবাহী চিৎমরম বৌদ্ধবিহারে উদযাচিত সাংগ্রাই উৎসবে যোগ দেওয়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তরুণরা মাথায় গমং ও গায়ে জামা ও লুঙি পরে এসেছিল। আর তরুণীরা এসেছিল আঞ্জি ও থামি পরে যা মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে মারমাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো —

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা এ ধর্মেরই অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধবিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু 'ভান্তে'দের দেখা যায়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা ইত্যাদি দিনগুলোতে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করে। কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে চন্দ্রঘোনার কাছে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত 'চিৎমরম বৌদ্ধবিহার।' মারমাদের নির্মিত এটি খুবই সুন্দর বৌদ্ধবিহার। প্রতি বছর বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সেখানে বুদ্ধ প্রণাম ও পূজা করতে যায়।

ঘ উদ্দীপকে মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে।মারমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিচে আলোচনা করা হলো—

সামাজিক জীবন: পার্বত্য অঞ্চলে বোমাং সার্কেলে মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা। প্রত্যেক মৌজায় কতকগুলো গ্রাম রয়েছে। গ্রামবাসী গ্রামের প্রধান মনোনীত করে। মারমারা গ্রামকে তাদের ভাষায় 'রোয়া' এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে। মারমারা পিতৃপ্রধান হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এদের সমাজে পারিবারিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মেয়েদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক জীবন: মারমারা নদীর তীরে সমতল স্থানে তাদের গ্রামগুলো নির্মাণ করে। মারমাদের ঘরবাড়ি বাঁশ ও ছনের তৈরি। মারমা পুরুষরা মাথায় গমবং, গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। তাদের মহিলারা গায়ে যে ব্লাউজ পরে তার নাম আঞ্জি। এছাড়া তারা 'থামি' পরে। কাপড় বোনার কাজে মারমা নারীরা বেশ দক্ষ। মারমারা পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও নানা ধরনের শাকসবজি খায়।

প্রশ্ন ▶৭ মং উশান পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী। সে ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়, শূকরের মাংস এবং শুঁটকি তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। বিভিন্ন উৎসবে তার মা যখন পিঠা বানায় তাও সে খুব মজা করে খায়। উৎসবের সময় জলকেলি তার সবচেয়ে ভালো লাগে। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. রাখাইন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে কোন শব্দদ্বয় থেকে? ১

খ. মণিপুরিদের গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে গারোদের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাখাইন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'রক্ষা' ও 'রাক্ষাইন' শব্দদ্বয় থেকে।

খ মণিপুরিদের মধ্যে গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

মণিপুরিদের মধ্যে দুটি শ্রেণি হলো—১. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও ২. মৈতৈ মণিপুরি। তন্মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা হচ্ছে ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী আর মৈতৈ মণিপুরিরা হচ্ছে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক।

গ উদ্দীপকে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত অন্যতম এথনিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে রাখাইন। তাদের আবাসস্থল হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা। তাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়। তাদের খাবারের তালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও শুঁটকি থাকে। তারা বিভিন্ন উৎসবে অনেক মজা করে। তারা বর্ষবরণ বা নববর্ষ উদযাপনে জলকেলি খেলা বা পানি উৎসব পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মং উশান পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী। সে ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়, শূকরের মাংস এবং শুঁটকি তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। বিভিন্ন উৎসবে তার মা যখন পিঠা বানায় তাও সে খুব মজা করে খায়। উৎসবের সময় জলকেলি তার সবচেয়ে ভালো লাগে।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মং উশানের জীবনযাত্রায় রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত নৃগোষ্ঠীর অর্থাৎ, রাখাইনদের সংস্কৃতির সাথে গারোদের সংস্কৃতির সাদৃশ্যতা ও বৈসাদৃশ্যতা উভয় বিদ্যমান।

বাংলাদেশের রাখাইন নৃগোষ্ঠীর প্রায় শতভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বাংলাদেশে যেসব গারো রয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগই খ্রিস্টান। বাকিরা হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ভোটবর্মী ভাষাগোত্রের অন্তর্গত। অন্যদিকে গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা। রাখাইন যুবকরা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি, শার্ট ও মেয়েরা লুঙ্গি, ব্লাউজ, ওড়না ইত্যাদি পরিধান করে। অন্যদিকে গারোর মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গির মতো করে টুকরা কাপড় আর পুরুষ ধুতি পরিধান করে।

রাখাইনদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সঙ্গে সবরকমের মাছ, মাংস, শাকসবজি খায়। অন্যদিকে গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাংস এবং মদ অন্যতম পানীয়। রাখাইনদের পরিবারের প্রধান হলো পিতা, পক্ষান্তরে গারোদের পরিবারের প্রধান হলো মাতা। রাখাইনদের মধ্যে বংশগত অর্থাৎ চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্যদিকে গারো সমাজেও অনুরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাখাইন ও গারোদের সাংস্কৃতিকগত দিক থেকে মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ করা যায়।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৮ পরেশ নন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাইবাল কোটা পদ্ধতিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এখন তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও লিখছেন। সম্প্রতি নিজ উপজাতির ভাষা সংস্কৃতির ওপর একটি ওয়েবসাইট খুলেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ এথনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মনে করেন, বাংলা উপভাষায় লেখা এ সাইটটি আমাদের নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ দেবতা কে? ১

খ. সাঁওতালদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের পরেশ নন্দী কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক জীবনধারা আলোচনা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ দেবতা হলো 'চান্দো'।

খ সাঁওতালরা সারা বছর নানা ধরনের পূজা-পার্বণের আয়োজন করে।

পৌষ মাসে বছরের প্রধান ফসল তোলার পর 'সোহরাই' পূজার আয়োজন করে, আর এ উৎসব তিন দিন পর্যন্ত চলে। মাঘ মাসে 'মাঘ-সিম' পর্বের আয়োজন করে, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যায় হয় বসন্তোৎসব বা 'বাহা'। 'বাহা' উৎসব ৭ দিন ধরে চলে। আষাঢ়ে হয় 'এরবাং সিম' পর্ব এবং ভাদ্র মাসে হয় 'হাড়িয়ার সিম' পর্ব। সাঁওতালরা সারা বছরই নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ চাকমা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

ঘ চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনধারা আলোচনা করো।

প্রশ্ন ▶১ পরিমল ভৌমিক রাঙামাটির বাসিন্দা। তার গায়ের রং সুন্দর এবং ফর্সা, মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধর পাতলা, নাক চ্যাপ্টা এবং দাড়ি গোঁফ কম। তার স্বাস্থ্য সুগঠিত এবং উচ্চতা প্রায় ৫´-৬´´। সে গ্রামকে আদাম বলে। তাদের সমাজে বিদ্যমান সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংগঠন হলো পরিবার।

◀ *শিখনফল-১*

ক. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের প্রধান কয়টি অঞ্চলে বাস করে? ১

খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাড়িঘর ও বিবাহ রীতি আলোচনা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের প্রধান চারটি অঞ্চলে বাস করে।

খ সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।

বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, এথনিক সম্প্রদায় নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারী, তারা আধুনিক পেশাসহ এক ধরনের নির্দিষ্ট জীবিকা পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়। সর্বোপরি তাদের জীবন একই ধরনের সামাজিক আচার, প্রথা, বিশ্বাস, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকে চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানজুড়ে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় চাকমারা বসবাস করে এবং তাদের গায়ের রং সুন্দর ও ফর্সা, মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধর পাতলা, নাক ট্যাপ্টা এবং দাড়ি-গোঁফ কম। পরিময় ভৌমিক রাঙামাটির বাসিন্দা এবং তার গায়ের রং সুন্দর এবং ফর্সা, মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধর পাতলা, নাক চ্যাপ্টা এবং দাড়ি-গোঁফ কম। এছাড়া পরিমল ভৌমিকের স্বাস্থ্য সুগঠিত এবং উচ্চতা প্রায় ৫´—৬´´ যা চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। কেননা চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও স্বাস্থ্য সুগঠিত এবং উচ্চতা গড়ে প্রায় ৫´–৬´´। পরিমল ভৌমিকের ক্ষেত্রে আরও দেখা যায়, সে গ্রামকে আদাম বলে এবং তাদের সমাজে বিদ্যমান সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংগঠন হলো পরিবার যা চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও গ্রামকে আদাম বলে এবং তাদের সমাজের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষুদ্র সংগঠন হলো পরিবার।

ঘ চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাড়িঘর ও বিবাহ রীতি বৈচিত্র্যময়।

চাকমারা সাধারণত মাটি থেকে প্রায় ৬ ফুট উঁচুতে মাচার ওপর ঘর তৈরি করে সেখানে বসবাস করে। ঘরটিকে কয়েকটি কামরায় ভাগ করা হয়। ঘরে ওঠার জন্য তারা মংগু (মই) ব্যবহার করে। সচরাচর ছোট ছোট নদীর তীরে খোলামেলা জায়গায় এদের গ্রামগুলো গড়ে ওঠে। তবে ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর তৈরি করা তাদের গ্রামের বাড়িঘরগুলো দেখতে খুবই সুন্দর হয়।

চাকমা সমাজে নিজ বংশের সাত পুরুষের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ। এদের মাঝে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয়টিই প্রচলিত রয়েছে। চাকমা সমাজে বহু স্ত্রী বিবাহ ও বিধবা বিবাহের অনুমোদন রয়েছে। এছাড়া প্যারালাল কাজিন বিবাহও সীমিত অর্থে প্রচলিত রয়েছে ঠিক, তবে আপন চাচাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠানে সামাজিকভাবে বিধি-নিষেধ রয়েছে। সহজ কথায় পাত্রী পছন্দের ব্যাপারে অভিভাবকের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। চাকমাদের বিবাহ রীতিতে সাধারণত বর কনের বাড়িতে যায় না। বরপক্ষের লোকেরা গিয়ে কন্যাকে তুলে এনে বরের বাড়িতেই বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করে। সাধারণত চাকমাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা— বন্দোবস্ত বিবাহ ও রোমান্টিক বিবাহ। চাকমা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনারও প্রচলন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ দৃশ্যপট-১: বাংলাদেশে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাদের সমাজে বুধবার মৃতদেহ পোড়ানো নিষেধ রয়েছে।

দৃশ্যপট-২: বাংলাদেশে বসবাসকারী অপর একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যারা ভাষাগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত। একটি টিবেটো বার্মান শাখার কুকি চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং অপরটি ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত। এদের মধ্যে তিনটি জাতিসত্তা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও পৃথক। ◀ *শিখনফল-১ ও ২*

ক. ক্ষমতা কী? ১

খ. সিন্ধু সভ্যতার নগরজীবন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ বাংলাদেশের কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে? তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-১ ও দৃশ্যপট-২-এ উল্লিখিত বাংলাদেশের দুইটি ক্ষুদ নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা ও কার্যপ্রণালী ভিন্ন- তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরের আচরণকে প্রভাবিত করবার সামর্থ্য অথবা অপরের কার্যসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রভাব অর্জন করাই হলো ক্ষমতা।

খ সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল একটি সু-পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবাঙ্গান নগরগুলোর গঠনরীতি ছিল একই ধরনের। নগরের ভবনগুলো ছিল পোড়ানো ইটের তৈরি। এছাড়া নগরের রাস্তাগুলো ছিল বেশ প্রশস্ত। সিন্ধু সভ্যতার নগরের উন্নতমানের প্রশাসন ব্যবস্থা, প্রশস্ত রাস্তা, পয়ঃপ্রণালি, খাজনা আদায় প্রথা, নগর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পৌরসভা, উন্নত গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা, বৃহৎ স্নানাগার এ সভ্যতার উন্নত নাগরিক জীবনের পরিচায়ক। A

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দৃশ্যপট-১-এ বাংলাদেশের চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা। এদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় এদের বসবাস। এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। চাকমারা প্রাচীনকাল থেকে তিব্বেতো বর্মণ পরিবারভুক্ত। আরাকানি ভাষা ব্যবহার করলেও বর্তমানে তারা ইন্দো-ইউরোপীয়ান আরাকানি ভাষা ব্যবহার করে। এছাড়া তারা একটি বাংলা উপভাষায় কথা বলে যা চাকমা ভাষা বা চাঙমা ভাষা নামে পরিচিত। এদেশে এসে তারা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেশী বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে।

দৃশ্যপট: ১ এ যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, যা চাকমা নৃগোষ্ঠীকেই নির্দেশ করে। চাকমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ঐতিহ্যগতভাবে চাকমারা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাদের ব্যক্তি মালিকানায় জমি বরাদ্দ না দেওয়ায় তারা সমতল নিম্ন ভূমিতে হাল চাষের মাধ্যমে ধান চাষ করে। এমনকি রাবার ও কাঠের গাছ চাষ করে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করেন। চাকমাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো তাঁতজাত বস্ত্র তৈরিসহ মোরগ-মুরগি, শূকর ইত্যাদি পালন করা। তাছাড়া তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুঁড়ি, ফাঁদ, পাখা, চিরুনি, বাঁশি ও বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ব্যবসায় নিয়োজিত। এদের পারিবারিক ক্ষমতা স্বামীর বা বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তুলনায় চাকমাদের আর্থ-সামাজিক চিত্র ভিন্ন ধরনের।

ঘ 'দৃশ্যপট–১ ও দৃশ্যপট–২ এ বর্ণিত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, দৃশ্যপট–১ এ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা এবং দৃশ্যপট–২ এ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গারোদের কথা বর্ণিত হয়েছে। চাকমা ও গারো বাংলাদেশের দুটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলেও তাদের জীবনধারা ও কার্যপ্রণালী ভিন্ন।

চাকমা সমাজ পিতৃপ্রধান। পিতার বংশ পরিচয়ে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় ও উত্তরাধিকার প্রথা নির্ণীত হয়। অন্যদিকে, গারোদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। তারা মায়ের সূত্র ধরে বংশের পরিচয় দেয় এবং মা মারা গেলে মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হয়। চাকমারা দেব-দেবীর পূজা করে। আর গারোরা জড়বস্তু ও দেব-দেবীর পূজা করে। পুরুষ চাকমারা ধুতি, পাঞ্জাবি, শার্ট ও গামছা পরে। মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। অন্য দিকে গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো দকমান্দা শাড়ি। পুরুষদের ঐতিহাসিক পোশাক হলো 'গান্দো'। গারোরা ছন দিয়ে ঘর তৈরি করে। ধনী গারোরা টিনের ঘর তৈরি করে। আর চাকমারা মাচার উপর বাঁশের তৈরি ঘরে বাস করে। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। অন্য দিকে বাংলাদেশের ৯০% গারো ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। চাকমারা কৃষিজীবী। তারা জুম চাষ করে। অন্যদিকে গারোরাও কৃষিকাজ ও পশুপালন করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চাকমা ও গারো বাংলাদেশের দুটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলেও তাদের জীবনধারা ও কার্যপ্রণালি ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶৩ ঢাকার মণিপুরি পাড়ার বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমাদের মহল্লার নামে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি আছে; যারা বৃহত্তর সিলেট জেলায় বাস করে। এদের নিজস্ব একটি ভাষার নাম মৈতৈ। শারীরিক গঠন কাঠামোগত বিবেচনায় এদের সাথে চীনা ও বার্মিজদের মিল পাওয়া যায়। ◀ *পিখনফল: ৪*

ক. কারা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেয়? ১

খ. সাঁওতালদের রাজনৈতিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক গারোরা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেয়।

খ সাঁওতালরা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মানুষ।

সাঁওতাল গ্রাম কয়েকটি বৃত্তে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি বৃত্তের তত্ত্বাবধান করেন একজন 'পঞ্চায়েত' যার অধিকারে কয়েক একর নিষ্কর ভূমি থাকে। প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েত রয়েছে। 'মাঝি' হলো গ্রামপ্রধান। তার একজন সহকারীও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে তারা তাদের দৈনন্দিন নানা বিষয় এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। এরা একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হলেও এই অঞ্চলে বিশ শতকের প্রথম ভাগে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ বেশ আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা।

গ উদ্দীপকে মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর মতো মণিপুরিরাও বহিরাগত। কথিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক মণিপুরি রাজপুত্র কোনো কারণে বর্তমান সিলেট অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। তিনি এবং তার সফর সঙ্গীরাই বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

মণিপুরি পাড়ার বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমাদের মহল্লার নামে একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি আছে; যারা বৃহত্তর সিলেট জেলায় থাকে। তাদের নিজস্ব ভাষার নাম মৈতেয়। শারীরিক গঠন কাঠামোগত বিবেচনায় চীনা ও বার্মিজদের সাথে এদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপকের বর্ণনানুসারে এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে পাঠ্যবইয়ের মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুরোপুরি মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ মণিপুরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যময়।

বাংলাদেশের মণিপুরি সম্প্রদায় ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক মণিপুরি রাজপুত্র কোনো কারণে বর্তমানে সিলেট অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তিনি এবং তার সফরসঙ্গীরাই মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

গোত্র বিভাগ অনুসারে মণিপুরিদের মধ্যে দুইটি ভাষা প্রচলিত। যথা-বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ও মৈতৈ ভাষা। মণিপুরিরা হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণবীয় মতবাদে বিশ্বাসী। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতোই মণিপুরিরা দুইটি গোত্রে বিভিক্ত। যথা- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈতৈ মণিপুরি। মণিপুরিদের পাড়াভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের ঘরবাড়িগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ছনের ছাউনি দেয়া, বাঁশের বেড়া ঘেরা কুঁড়েঘর। এছাড়া টিনের ছাউনি দেওয়া দালানঘর রয়েছে। মণিপুরিদের পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ। এ পোশাক তারা নিজেরাই তৈরি করে থাকে।

মণিপুরিদের মধ্যে বহির্বিবাহ প্রচলিত। বিধবা বিবাহ, তালাকপ্রাপ্ত রমণীদের বিবাহ প্রচলিত। পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। মণিপুরিদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। এরা স্থানান্তর ও সমতল ভূমিতে কৃষিকাজ করে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই কৃষিকাজ করে।

এরা হিন্দুধর্মের বৈষ্ণবীয় মতবাদে বিশ্বাসী। মণিপুরি পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরিধান করে। বর্তমানে মেয়েদের শাড়ি পরতে দেখা যায়। মণিপুরিরা ভাত, মাছ, শাকসবজি খেয়ে জীবনধারণ করে। মাংস খায় না; তাই তাদেরকে নিরামিষভোজী বলা হয়। মণিপুরিদের নৃত্য ও সংগীত বেশ প্রসিদ্ধ। বিবাহ-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের নৃত্যের মধ্যে 'লাইহারাউবা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ৪ ছক-ক ছক-খ

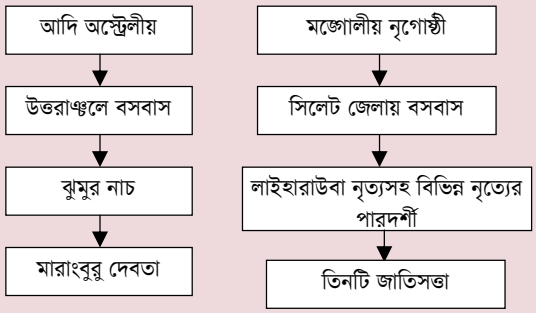

◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. চাকমা সার্কেলের প্রধান কে? ১

খ. চাকমাদের সামাজিক সংগঠনের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ক ও খ নং ছক কোন কোন নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বহন করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠী দুটির আর্থ-সামাজিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা রাজা। A

খ বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমারা প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত। যথা– ১. চাকমা (Chakma) ২. তঞ্চঙ্গা (Tanchangya) এবং দৈংনক (Doingank)। চাকমা ও তঞ্চঙ্গা উভয় সমাজে প্রায় ৪৬টির মত উপদল রয়েছে। চাকমা সমাজে বিদ্যমান ক্ষুদ্র সংগঠনই হলো পরিবার তারপর গোত্তি বা গোজা। এর চেয়ে বৃহৎ আয়তনের সামাজিক একক হচ্ছে পাড়া বা আদাম। তার চেয়েও অধিক আয়তন হলো গ্রাম বা মৌজা। এভাবে মৌজার পরবর্তীতে বৃহত্তর চাকমা সমাজ বলতে চাকমা সার্কেল তথা চাকমা জাতির সংগঠনকে বোঝায়। A

গ উদ্দীপকের ক ও খ নং ছক সাঁওতাল ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বহন করে। A

উদ্দীপকে ছক-ক এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো, আদি অস্ট্রেলীয়, উত্তরাঞ্চলে বসবাস, ঝুমুর নাচ, মারঙবুরু দেবতা। আমরা জানি, বাংলাদেশের রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও দিনাজপুর জেলায় অধিকাংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সাঁওতালরা অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হলো ঠাকুর জিংরা আর জাগিত দেবতা মারঙবুরু। সুতরাং উদ্দীপকে ছক-ক এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারা সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে, উদ্দীপকের ছক-খ এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য হলো, মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী, সিলেট জেলায় বসবাস। লাইহারাউবা নৃত্যসহ বিভিন্ন নৃত্যে পারদর্শী, তিনটি জাতিসত্তা। এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সিলেট জেলার মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মণিপুরিদের বিভিন্ন প্রকারের নাচ সর্বমহলে অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রশংসিত। এছাড়াও এরা গঠনগত দিক থেকে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের ছক-ক ও খ যথাক্রমে সাঁওতাল ও মণিপুরিদের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ঘ উদ্দীপকের সাঁওতাল ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। A

সাঁওতালরা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মানুষ। তাদের সমাজ সংগঠন খুবই দৃঢ় এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাঁওতাল সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। এ সমাজে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অধিকার থাকে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিতে কন্যাদের কোন অধিকার থাকে না। বর্তমানে সাঁওতালদের জীবিকার প্রধান উপায় হলো কৃষিকাজ। এছাড়া কিছু কিছু সাঁওতাল জেলে, কুলি, চা বাগানে মাটি কাটার কাজও করে থাকে। অনেকে ঘরে বসে বিভিন্ন কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো খুব একটা সচ্ছল নয়। অপরদিকে, মণিপুরিদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হলো কৃষি। এরা বেশ কর্মঠ হওয়ায় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কৃষিকাজে লিপ্ত হয়। মণিপুরিদের সমাজকে স্বনির্ভর অর্থনীতিভিত্তিক সমাজও বলা যায়। মণিপুরিদের নির্মিত তাঁতজাত বস্ত্রাদি এক বিরাট অর্থকরি দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। এদের পারিবারিক জীবনযাত্রায় পিতাই পরিবারের সর্বেসর্বা। এ

সমাজে একই গোত্রভুক্ত লোকদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এছাড়াও মণিপুরি বৈষম্য ধর্মের অনুসারী এবং সাঁওতালরা মূলত বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা যেকোনো মঙ্গল-অঙ্গালের জন্য সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মণিপুরি ও সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতির ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

প্রশ্ন ▶৫ মং উশান পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী। সে ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়, শূকরের মাংস এবং শুঁটকি তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। বিভিন্ন উৎসবে তার মা যখন পিঠা বানায় তাও সে খুব মজা করে খায়। উৎসবের সময় জলকেলি তার সবচেয়ে ভালো লাগে। *◀ শিখনফল: ৮*

ক. রাখাইন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে কোন শব্দদ্বয় থেকে? ১

খ. মণিপুরিদের গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে গারোদের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাখাইন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'রক্ষা' ও 'রাক্ষাইন' শব্দদ্বয় থেকে।

খ মণিপুরিদের মধ্যে গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

মণিপুরিদের মধ্যে দুটি শ্রেণি হলো—১. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও ২. মৈতৈ মণিপুরি। তন্মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা হচ্ছে ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী আর মৈতৈ মণিপুরিরা হচ্ছে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক।

গ উদ্দীপকে রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত অন্যতম এথনিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে রাখাইন। তাদের আবাসস্থল হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা। তাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়। তাদের খাবারের তালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও শুঁটকি থাকে। তারা বিভিন্ন উৎসবে অনেক মজা করে। তারা বর্ষবরণ বা নববর্ষ উদযাপনে জলকেলি খেলা বা পানি উৎসব পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মং উশান পটুয়াখালী জেলার অধিবাসী। সে ভাতের সাথে মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খায়, শূকরের মাংস এবং শুঁটকি তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার। বিভিন্ন উৎসবে তার মা যখন পিঠা বানায় তাও সে খুব মজা করে খায়। উৎসবের সময় জলকেলি তার সবচেয়ে ভালো লাগে।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মং উশানের জীবনযাত্রায় রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত নৃগোষ্ঠীর অর্থাৎ, রাখাইনদের সংস্কৃতির সাথে গারোদের সংস্কৃতির সাদৃশ্যতা ও বৈসাদৃশ্যতা উভয় বিদ্যমান।

বাংলাদেশের রাখাইন নৃগোষ্ঠীর প্রায় শতভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বাংলাদেশে যেসব গারো রয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগই খ্রিস্টান। বাকিরা হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ভোটবর্মী ভাষাগোত্রের অন্তর্গত। অন্যদিকে গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা। রাখাইন যুবকরা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি, শার্ট ও মেয়েরা লুঙ্গি, ব্লাউজ, ওড়না ইত্যাদি পরিধান করে। অন্যদিকে গারোর মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গির মতো করে টুকরা কাপড় আর পুরুষ ধুতি পরিধান করে।

রাখাইনদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সঙ্গে সবরকমের মাছ, মাংস, শাকসবজি খায়। অন্যদিকে গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাংস এবং মদ অন্যতম পানীয়। রাখাইনদের পরিবারের প্রধান হলো পিতা, পক্ষান্তরে গারোদের পরিবারের প্রধান হলো মাতা। রাখাইনদের মধ্যে বংশগত অর্থাৎ চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্যদিকে গারো সমাজেও অনুরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাখাইন ও গারোদের সাংস্কৃতিকগত দিক থেকে মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ করা যায়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ মাথিন চাকমা তার বান্ধবী শুভ্রার নানাবাড়ি ময়মনসিংহে বেড়াতে গেল। সেখানে সে লক্ষ করল, পরিবারের সব বিষয়ে শুভ্রার মায়ের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এতে সে একটু অবাক হয়ে শুভ্রাদের সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-আচরণ, জীবিকা নির্বাহ প্রভৃতি বিষয় খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল। *◀ শিখনফল: ১ ও ২*

ক. 'মারমা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে? ১

খ. 'সাংগ্রাই' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাথিনের অবাক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদ্বয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪